ISSN 2072-3334
Development Compilation
Volume 09. Number 01. July 2013

জাতিসংঘে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনের স্বীকৃতি : একটি পর্যালোচনা

মো. জিয়াউল হক শেখ*
মোছা. আছিয়া পারভীন**

Abstract : The Recognition of Palestine as the `observer non-member state' by the UN General Assembly on November 29, 2012 marked significant diplomatic victory against Israel in the international politics. Through this epoch-making outcome, Palestine achieved an indirect recognition of their claims on statehood of Palestine in the West Bank, East Jerusalem and Gaza Strip. This diplomatic triumphant reinforces not only its hand of negotiations in international arena especially with Israel for a two-state solution, but also it paves the way of Palestine authority to participate in debate in the General Assembly. Besides, it allows them to join a number of UN agencies, as well as the International Criminal Court (ICC). The aim of present study is to analyze the Palestine present condition in the United Nations and its significance in the history of freedom movement of Palestinian from the perspective of historical approach.

ভূমিকা

গত ২৯ নভেম্বর ২০১২ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তিনকে ১৩৮-৯ ভোটে 'পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রে'[১] উন্নীত করে। ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের দীর্ঘ ১৮ মাসের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের অবস্থান 'পর্যবেক্ষক' থেকে 'পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রে' উন্নীত হওয়ায় শুধু 'রাষ্ট্র' নামক একটি নতুন শব্দই যোগ হয় নি, জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক মহলে দেশটির কূটনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রতিকী গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৭ সালে ফিলিস্তিনের উপর ব্রিটিশ ম্যানডেট এর অবসানের পর একই বছরের ২৯ নভেম্বর তথাকথিত 'বিভাজন পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক ইউনিয়ন' সংক্রান্ত প্রস্তাব ১৮১ পাশের মাধ্যমে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অখণ্ড ফিলিস্তিনকে ভেঙে একটি আরব রাষ্ট্র ও একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্টার সুপারিশ

* প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।
** প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সিলেট ক্যাডেট কলেজ।

করলেও পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বিরোধিতার কারণে আরব রাষ্ট্র হিসেবে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে জাতিসংঘে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়ার পটভূমি হিসেবে ১৯৪৭ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের অবস্থান, এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পরাশক্তি সমূহের ভূমিকা এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্টার ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য আলোচনা করার প্রয়াস চালানোর প্রচেষ্টা করা হবে।

গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহ

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধটি সামাজিক গবেষণার 'ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি (Historical Approcah)' পদ্ধতি অনুসরণ করে ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানের জন্য জাতিসংঘের নেয়া বিভিন্ন প্রস্তাব বিশেষ করে সম্প্রতি নেয়া ফিলিস্তিনকে 'পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রে' উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি ও ফিলিস্তিনীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এর সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণের জন্য পর্যবেক্ষণশীল বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন আকারে লিখিত হয়েছে। প্রবন্ধটি লিখতে ফিলিস্তিন সমস্যার পটভূমি আলোচনার সময় সমসাময়িককালের বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহকে প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি ঘটমান বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে।

ফিলিস্তিন সমস্যার সূত্রপাত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়প্রবাহে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে বড় আলোচনার বিষয় ছিল ব্রিটিশ হুকুমনামার (Mandate) অধীনে থাকা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নিয়ে। চেইম ওয়াজম্যান এর ১৯১৭ সালে বালফোর ঘোষণার পরবর্তী সময় থেকেই ইহুদি জনগোষ্ঠী নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করে ফিলিস্তিনে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার। এর আগে ১৯১৬ সালের ১৬ মে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বাক্ষরিত গোপন চুক্তি অনুসারে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে আন্তর্জাতিকীকরণ[২] করার প্রস্তাব থাকলেও প্রথম বিশযুদ্ধের পর ফিলিস্তিন চলে যায় ব্রিটিশ হুকুমনামার অধীনে। শুরু থেকেই ব্রিটিশরা ইহুদি জনগোষ্ঠীর প্রতি ফিলিস্তিনে তাদের সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইতিবাচক ও অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি দেখালেও ভারতে তাদের ঔপনিবেশিক আধিপত্য রক্ষার জন্য ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে আরব জনগণের নিকট তারা বিরাগভাজন হতে চায়নি। কারণ, তারা মনে করত এ ধরনের প্রচেষ্টা আরব মুসলিম জনগণকে বিরাগভাজন করবে, যা ভারতের মুসলমানদেরকে ব্রিটিশবিরোধী করতে উৎসাহ প্রদান করবে। তাই ১৯৩৯ সালের মে মাসে তৎকালীন রক্ষণশীল ব্রিটিশ সরকার এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করে, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইহুদি বাস্তুত্যাগীদের আগমন

সীমিত করে আরব জনগণের সমর্থন আদায় করা। ব্রিটিশদের এ নীতির কারণে ইহুদি জনগোষ্ঠী দ্বিধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রপন্থী এবং দুই. ব্রিটিশপন্থী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রপন্থী ইহুদি জনগোষ্ঠী বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নানাভাবে ব্রিটিশ স্বার্থে আঘাত হেনে একধরনের রাজনৈতিক চাপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে তাদের দাবির পক্ষে একধরনের কূটনৈতিক চাপ তৈরি করে। উভয়মুখী চাপের কারণে ১৯৪৫ সালে গঠিত হয় ইঙ্গ-মার্কিন কমিশন। কিন্তু এই কমিশন ১৯৪৬ সালে ৩০ এপ্রিল যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাতে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য কোন আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করা হয় এবং ফিলিস্তিনের সমগ্র অঞ্চলকে জাতিসংঘের অধীনে একটি "জিম্মাদার চুক্তির" (Trusteeship Agreement) আওতায় হুকুমনামার অধীনে রাখার প্রস্তাব করা হয়।[৩] তবে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ১০০.০০০ ইহুদি বাস্তুত্যাগীদের প্রবেশাধিকার দানের সুপারিশ করা হয়।[৪] এ সমস্যা নিয়ে তৎকালিন ব্রিটিশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে সম্পর্কের এক ধরনের টানাপড়েন শুরু হয় এবং ফিলিস্তিন সংকটের দায়ভার বৃটেন যুক্তরাষ্টের উপর চাপিয়ে দেয়। ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে আরব ও ইহুদিবাদী প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে এক সম্মেলনের আয়োজন করে। কিন্তু সে সম্মেলনও কোন সফলতা ছাড়া শেষ হয়। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে বেসেল-এ আহুত বিশ্ব ইহুদিবাদী কংগ্রেসে ব্রিটিশ সমর্থক চেইম ওয়াজম্যান ক্ষীণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিজয়ী হয়। ইহুদিবাদীদের নিকট ওয়াজম্যানের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ায় মার্কিন ইহুদিবাদীরা নেতৃত্বের সামনে চলে আসে এবং ক্রমশ ব্রিটিশরা এ সমস্যা সমাধানে অক্ষম হয়ে পড়ে।[৫]

জাতিসংঘে ফিলিস্তিন সমস্যা

১৯৪৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ বৈদেশিক সচিব বেভিন ফিলিস্তিন সমস্যাকে জাতিসংঘে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর ধারাবাহিকতায়, ১৯৪৭ সালের ২ এপ্রিল বৃটেন আনুষ্ঠানিকভাবে ভবিষ্যত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রূপরেখা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে জাতিসংঘকে আহ্বান জানায়। জাতিসংঘ ফিলিস্তিনের সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য অস্ট্রিয়া, কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, গুয়াতেমালা, ভারত, ইরান, নেদারল্যান্ডস, পেরু, সুইডেন, উরুগুয়ে ও যুগোশ্লাভিয়া কে নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট ফিলিস্তিনের উপর জাতিসংঘের বিশেষ কমিটি আন্সকপ (The United Nations Special Committee on Palestine-UNSCOP) গঠন করে। ১৯৪৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর উক্ত কমিটি জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে তাদের উত্থাপিত প্রতিবেদনে ফিলিস্তিন বিষয়ে সর্বসম্মত কোন প্রস্তাব দিতে ব্যর্থ হয়। দ্বিধাবিভক্ত প্রতিবেদনে কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, গুয়াতেমালা, নেদারল্যান্ডস, পেরু, সুইডেন, উরুগুয়ে এই ৭টি দেশ ফিলিস্তিন নিয়ে 'বিভাজন পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক ইউনিয়ন' গঠন করার জন্য তাদের মতামত পেশ করে। এ প্রস্তাব অনুসারে একের (Acre) শহরসহ পশ্চিম গ্যালিলি, সামারিয়া ও যুডিয়া এবং আসদদ এর উত্তারাঞ্চল থেকে গাজা উপত্যকা পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এই তিনটি অঞ্চল নিয়ে সমগ্র ফিলিস্তিনের ৪৩

শতাংশ আয়তনে আরব-ফিলিস্তিনদের নিয়ে একটি আরব রাষ্ট্র, হাইফা থেকে রেহভট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সমভূমি, দক্ষিণ গ্যালিলি এবং এইলট এই তিন অঞ্চল নিয়ে সমগ্র ফিলিস্তিনের ৫৬ শতাংশ আয়তনে একটি ইহুদি ইসরায়েল রাষ্ট্র এবং জেরুজালেম ও বেথেলহামকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রেখে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়।[৬]

১৯৪৭ সালের বিভাজন পরিকল্পনা অনুসারে লোকসংখ্যা[৭]

অঞ্চল	আরব ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী	শতাংশ হিসেবে আরব লোকসংখ্যা	ইহুদি লোকসংখ্যা	শতাংশ হিসেবে ইহুদি লোকসংখ্যা	সমগ্র লোকসংখ্যা
আরব রাষ্ট্র	৭২৫,০০০	৯৯%	১০,০০০	১%	৭৩৫,০০০
ইহুদি রাষ্ট্র	৪০৭,০০০	৪৫%	৪৯৮,০০০	৫৫%	৯০৫,০০০
আন্তর্জাতিক অঞ্চল	১০৫,০০০	৫২%	১০০০,০০০	৪৯%	২০৫,০০০
সমগ্র লোকসংখ্যা	১,২৩৭,০০০	৬৭%	৬০৮,০০০	৩৩%	১,৮৪৫,০০০

এছাড়া প্রস্তাবিত উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ১০ বছরের জন্য একটি অর্থনেতিক ইউনিয়ন গঠন করার প্রস্তাব করা হয়। অন্যদিকে ভারত, ইরান ও যুগোশ্লাভিয়া এই তিনটি রাষ্ট্র 'বিভাজন পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক ইউনিয়ন' সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং তারা প্রস্তাব করে একক সংযুক্ত ফিলিস্তিন রাষ্ট্র (Federal State of Palestine) প্রতিষ্ঠার।[৮]

ফিলিস্তিনি আরবদের অধিকার রক্ষার জন্য গঠিত উচ্চতর আরব কমিটি (Palestine Arab High Committee) জাতিসংঘ কতৃক প্রস্তাবিত এ বিভাজন পরিকল্পনাকে প্রত্যাখান করে। তারা দাবি করে যে, ফিলিস্তিনে বসবাসরত ইহুদিরা বহিরাগত, যারা ঊনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের শুরুর দিকে জাইওনিস্ট আন্দোলনের কারণে এ অঞ্চলে আসতে শুরু করে। সুতরাং তাদের আরব ভূখণ্ডে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোন বৈধ অধিকার নেই। আরবদের এ দাবির অনেক যৌক্তিকতাও ছিল, কারণ তখন এ অঞ্চলে ৬৫ শতাংশ অইহুদি আরব মুসলিম ও খ্রিস্টানদের বসবাস ছিল। আর ইহুদি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫ শতাংশ।[৯] তাই আরবরা মনে করে, মুসলিম ও খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ অধ্যুষিত এ অঞ্চলে একটিমাত্র আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই পারে এ অঞ্চলের মানুষের বৈধ অধিকার নিশ্চিত করতে এবং এ অঞ্চলে টেকসইভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। অন্যদিকে, ইসরাইলি অধিকার রক্ষায় গঠিত ইহুদি এজেন্সি এ বিভাজন পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিম গ্যালিলি ও পশ্চিম জেরুজালেমকে আরব রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা করে। তবে তারা সামগ্রিকভাবে এ পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

ফিলিস্তিনের উপর জাতিসংঘের বিশেষ কমিটির এ প্রতিবেদনের আরো খুঁটিনাটিসহ নানা দিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে একটি এডহক কমিটি গঠন করা হয়। এডহক কমিটি আন্সকপ (UNSCOP) প্রস্তাবিত সীমানার পরিবর্তন ঘটায় এবং

ইহুদী রাষ্ট্রের সীমানা এমনভাবে নির্ধারণ করে যেখানে ইহুদি জনসংখ্যা ৫৫ শতাংশ থেকে ৬১ শতাংশে উন্নীত হয়। যাহোক, পরিকল্পনাটি জাতিসংঘে প্রস্তাব আকারে পাশ করার জন্য ২৬ নভেম্বর সাধারণ সভায় উত্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু জাতিসংঘে এ প্রস্তাব উত্থাপন করলে প্রস্তাবের পক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে ২৬ নভেম্বরের ভোটাভুটি স্থগিত করা হয়। ফিলিপাইন, ভারত, চীনসহ অনেক রাষ্ট্র সরাসরি এ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়ার কথা জানায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নানা আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে জোর প্রচেষ্টা চালায়। এ প্রচেষ্টার ফলে ফিলিপাইনসহ অনেক দেশ এ প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২৯ নভেম্বর ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রস্তাবটি উত্থাপিত হলে ৩৩/১৩ ভোটে এ প্রস্তাবটি পাশ হয়। ভোটদানে বিরত থাকে ১০টি রাষ্ট্র।

ইহুদি রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়া এবং তাদের অভিবাসন সীমাবদ্ধ করে দেয়ায় সামান্য প্রতিবাদের মুখে ইহুদি এজেন্সি এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। তৎকালীন জেরুজালেমের মেয়র নাগিব বে, আরব শ্রমিক কংগ্রেসের সদস্য সচিব ফু'য়াদ নাসের ছাড়া আরব বিশ্বের প্রায় সকলেই এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অবস্থান করে। ১৯৮৮ সালে ফিলিস্তিন স্বাধীনতা সংস্থা (Palestine Liberation Organization-PLO) এ প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র তৈরি করে। জাতিসংঘে এ প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর বৃটেন এ প্রস্তাব বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধীরে চল নীতি অনুসরণ করে। বৃটেনের সংসদে এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘের বিভাজন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বৃটেন ১৯৪৭ সালের ১১ ডিসেম্বর ঘোষণা করে যে, ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ফিলিস্তিন অঞ্চলের উপর তাদের হুকুমনামার অবসান ঘটবে।[১০] মে মাসের ১৪ তারিখে তেলআবিব জাদুঘরে হারজেলের প্রতিকৃতির নিচে দাঁড়িয়ে ইসরাইলের ইহুদি জনগোষ্ঠী দেশটির স্বাধীনতা ঘোষণা করে। আরব বিশ্ব তা প্রত্যাখ্যান করে। শুরু হয় প্রথম আরব-ইসরাইল যুদ্ধ। ১৯৪৭ সাল থেকে ২০১২ পর্যন্ত গত ছয় দশকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রায় তিন শতাধিক এবং নিরাপত্তা পরিষদে প্রায় ২২৪টি প্রস্তাব পাশ হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ প্রস্তাবে ইসরাইলের বসতি নির্মাণের প্রক্রিয়া ও তার আগ্রাসী নীতির নিন্দা জানানো হলেও বাস্তবে ইসরাইল তা অব্যাহত রাখতে কখনই পিছু হঠেনি। জাতিসংঘে পাশকৃত প্রধান প্রধান প্রস্তাবগুলো হলো:

১৯৪৮ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় জাতিসংঘের ১৯৪ নং প্রস্তাব পাশ হয়। এ প্রস্তাবে নিজ নিজ ভূখণ্ডে থেকে প্রতিবেশিদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের শর্তে উদ্বাস্তদের বাড়িঘরে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া, জেরুজালেম নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিকীকরণ, ধর্মীয় স্থানগুলোর নিরাপত্তা এবং সেখানে অবাধ প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানের কথা বলা হয়। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসররাইল যুদ্ধে ইসরাইল ফিলিস্তিনের কাছ থেকে পশ্চিম তীর, গাজা, জেরুজালেম, মিসরের কাছ থেকে সিনাই এবং সিরিয়ার কাছ থেকে গোলান মালভূমি দখল

করে নিলে ১৯৬৭ সালে জাতিসংঘের ২৪২ নং প্রস্তাব পাশ করে এ যুদ্ধে দখলকৃত অঞ্চল থেকে ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহারের কথা বলা হয়।

ফিলিস্তিনকে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দানের জাতিসংঘের প্রথম ধাপ শুরু হয় ১৯৭৪ সালে ৩২৩৬ নং প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে। এ প্রস্তাবে ফিলিস্তিন জাতিসংঘের 'সি' ক্যাটাগরির "অরাষ্ট্রীয় পর্যবেক্ষক" এর স্বীকৃতি পায় এবং একই সাথে পিএলও-কে ফিলিস্তিনের জনগণের প্রকৃত ও বৈধ প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এ প্রস্তাবের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের অধিকারের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানানো হয়। এছাড়া বহির্বিশ্বের হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং নিজেদের বাড়িঘর ও সম্পদের মালিকানা ফিরে পাওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এ প্রস্তাবে অনুপ্রাণীত হয়েই পরবর্তী পর্যায়ে পিএলও ১৯৮৮ সালে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং তখন ১১৭টি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বর্তমানে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়া রাষ্ট্র সংখ্যা ১৩২টি।[১১] ১৯৮০ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ বিভিন্ন প্রস্তাবের মাধ্যমে গাজা, পশ্চিম তীর দখলকৃত অঞ্চলে ইসরাইলের নতুন বসতি নির্মাণের নিন্দা, জেরুজালেমসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরাইলের সহিংস কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানানো হয়। ২০০২ সালে ফিলিস্তিনকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ১৩৯৭ পাশ হয়। এ প্রস্তাবে সদস্য রাষ্ট্রগুলো ২০০০ সালের ব্যর্থ শান্তি আলোচনার পর এ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া সহিংসতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের দ্বন্দ্ব অবসানে এই দুই রাষ্ট্র নিরাপদ ও স্বীকৃত সীমান্তের অধীনে পাশাপাশি অবস্থান করবে বলে আহ্বান জানানো হয়।

পূর্ণ সদস্যপদের জন্য আবেদন

২০০৩ সালে জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয় ইউনিয়ন ও রাশিয়া এই চারপক্ষীয় উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রোডম্যাপ আলোচনা স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে ফিলিস্তিনিদের কোন আশার আলো দেখাতে পারেনি। নিরূপায় হয়ে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ২০১১ সালে জাতিসংঘের নিকট পূর্ণ সদস্যপদের জন্য আবেদন করে। কিন্তু জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেতে হলে শুধু সাধারণ পরিষদের সম্মতি নয়, নিরাপত্তা পরিষদেরও সমর্থনের প্রয়োজন হয়। নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচ স্থায়ী সদস্যের মধ্যে রয়েছে ইসরাইলের সবচেয়ে শক্তিশালী মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। তাই যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধীতার কারণে শেষ পর্যন্ত এ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে এ প্রস্তাব পাশ করা সম্ভব হয়নি।

পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের স্বীকৃতির জন্য আবেদন ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের বিরোধিতা সত্ত্বেও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনের জন্য ভোটাধিকারবিহীন পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা চালায় ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ। এই দুই রাষ্ট্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও[১২] ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে ফিলিস্তিন জাতিসংঘের শিক্ষা,

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা-ইউনেস্কো (United Nations Education, Scientific and Cultural Oragnization-UNESCO)-এর সদস্য পদ লাভ করার ফলে ফিলিস্তিনিদের জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা পাওয়ার বিষয়ে আরো বেশি আকাঙ্ক্ষিত করে তোলে। ২৮ নভেম্বর ২০১২ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্বের দিন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল নানা কূটনৈতিক চাপ তৈরি করে এ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট আদায়ের চেষ্টা করে। কিন্তু ২৯ নভেম্বর ২০১২ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এ প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটির কয়েক ঘণ্টা আগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত ইসরাইলের দূতাবাসগুলো ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জানাতে থাকে ইউরোপিয় দেশগুলো তাদের সিদ্ধান্ত বদল করে ভোট দিতে যাচ্ছে ফিলিস্তিনকে। এমনকি ইসরাইলি দৈনিক 'হারেৎস'-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, কয়েক ঘণ্টা আগেই জেরুজালেমের কর্মকর্তারা জেনে যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও চেকপ্রজাতন্ত্র ছাড়া আর কোন পশ্চিমা দেশের সমর্থন পাচ্ছেনা ইসরাইল । এর আগে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম হেগ বলেন, যুক্তরাজ্য ফিলিস্তিনের বিপক্ষে ভোট দেবে না। তবে যুক্তরাজ্য চায় কোন পূর্বশর্ত ছাড়া ইসরাইলের সাথে সমঝোতায় যাক ফিলিস্তিন।[১৩] ফিলিস্তিনকে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার এ ইস্যুতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের ইসরাইল বিরোধী হওয়ার কারণ হলো জার্মানি ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইসরাইলকে সহায়তা করতে চেয়েছিল। শর্ত হিসেবে তারা ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণ বন্ধ করতে আহ্বান করেছিল। কিন্তু ইসরাইল ইহুদি বসতি নির্মাণ সম্প্রসারণ বন্ধের জার্মানিসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রস্তাব বারবার প্রত্যাখান করায় জার্মানি সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশের সাথে ইসরাইলের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এছাড়া নবনির্বাচিত ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাদ ফিলিস্তিনের এ ইস্যুতে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ফিলিস্তিনকে সমর্থন দেবে ফ্রান্স।[১৪] আর যুক্তরাজ্য চেয়েছিল ফিলিস্তিনের এ ইস্যুতে ভোট দেয়া থেকে বিরত থেকে বিনিময়ে ফিলিস্তিন থেকে এই বিষয়ে সমর্থন আদায় করে নেয়া যে, ইসরাইলের যুদ্ধাপরাধ ও মানবাধিকার লংঘনের বিষয় সংক্রান্ত কোন অভিযোগ ফিলিস্তিন আন্তর্জাতিক আদালতে উত্থাপন করবে না। যদিও ফিলিস্তিন এ বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কি-না তা আজ অবধি জানা যায়নি।

পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি

যাহোক, শেষ পর্যন্ত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৭তম অধিবেশনে এ/আরইএস/৬৭/১৯ নং প্রস্তাবের মাধ্যমে ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের ভোটাধিকারবিহীন "পর্যবেক্ষ রাষ্ট্রে" উন্নীত করা হয়। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৩৮টি দেশ এ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদান করে, ৯টি রাষ্ট্র বিপক্ষে ভোট প্রদান করে এবং ৪১টি রাষ্ট্র ভোট দানে বিরত থাকে।[১৫] ইউরোপিয় দেশগুলো মধ্যে অষ্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফ্রান্স, গ্রিস, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ মাল্টা, পর্তুগাল, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ডসহ

মোট ১৭টি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদান করে যুক্তরাজ্য, জার্মানি, নেদারল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লিথুনিয়া ভোটদানে বিরত থাকে এবং চেকপ্রজাতন্ত্র প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়।[১৬]

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামে এর প্রভাব

ফিলিস্তিনের এ স্বীকৃতির ফলে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের অবস্থান 'গ' স্তর "পর্যবেক্ষক" থেকে 'খ' স্তর "পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রে" উন্নীত হওয়ায় কেবল একটি শব্দই বাড়েনি, দেশটির আন্তজার্তিক অঙ্গনে কূটনৈতিক ও প্রতিকী গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রস্তাব পাশ হওয়ার ফলে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌম নায্য দাবীর নৈতিক বিজয় হয়েছে। ত্বরান্বিত হয়েছে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র পাওয়ার পথও। এ বিজয়ের ফলে ফিলিস্তিনিরা জাতিসংঘের অনেক সংস্থার সদস্য হতে পারবে। বিশেষ করে ফিলিস্তিন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) এর সদস্য হতে পারবে এবং যে কোন সময় দখলকৃত অঞ্চল থেকে সেখানে বসবাসরত অধিবাসীদের বিতাড়ন, গণহত্যা, যুদ্ধপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ইসরাইলীদের এ আদালতে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে।

প্রস্তাবটি পাশ হওয়ার পর তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমেদ দাওতুগলু যখন মাহমুদ আব্বাসকে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় পরিচয় করে দেন তখন তিনি তার প্রতিক্রিয়ায় এ প্রস্তাবকে সার্বভৌম ফিলিস্তিনের 'জন্ম সনদ' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[১৭] হামাস ইসরাইলের সাথে মাহমুদ আব্বাসের যে কোন শান্তি আলোচনার বিরোধিতা করে আসলেও এ প্রস্তাবকে সতর্কতার সাথে স্বাগত জানায় এবং এ প্রস্তাব যেন ফিলিস্তিনিদের জন্য শুভঙ্করের ফাঁকি না হয়ে প্রকৃতার্থেই স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠার পথে ইতিবাচকভাবে কাজ করে সে বিষয়ে সকলকে সচেষ্ট থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানায়। ফিলিস্তিনের সাধারণ জনগণও আনন্দের সাথে এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। প্রস্তাব পাশের পর রশিদ আল কর নামের ৩৯ বছরের এক ব্যক্তি আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, 'আমরা আনন্দিত, কারণ আমরা নৈতিক বিজয় লাভ করেছি। জানি যে, স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য আরো কাঠখড় পোড়াতে হবে, যেতে হবে বহু দূর। এটা ভেবেই খুব ভালো লাগছে যে আমাদের যাত্রা সুগম করবে জাতিসংঘের এই স্বীকৃতি'।[১৮] আরববিশ্ব জাতিসংঘের এ স্বীকৃতিকে স্বাগত জানায়। কিন্তু ইসরাইল ও তার ঘনিষ্ট মিত্র যুক্তরাষ্ট্র এ প্রস্তাবের সমালোচনা করে। প্রস্তাব পাশের পর ক্ষোভ প্রকাশ করে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মুখপাত্র রেগেভ বলেন, এটি নেতিবাচক রাজনৈতিক নাটক, যা আমাদের সবাইকে সমঝোতা প্রক্রিয়ার বাইরে ঠেলে দেবে। প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইসরাইল জাতিসংঘে এ প্রস্তাব পাশ করার পরের দিনই নতুন করে ফিলিস্তিনে ৩০০০ ইহুদি বসতি স্থাপনের ঘোষণা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন বলেন, এই ভোট দুর্ভাগ্যজনক এবং এর মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক বড় বাঁধার সৃষ্টি হলো।[১৯]

ফিলিস্তিনীদের এই ঐতিহাসিক অর্জন তাদের ভবিষ্যৎ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কতটুকু সফল ভূমিকা পালন করবে তা নির্ভর করবে তাদের আগামী দিনের সমন্বীত ও ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ ও সংগ্রাম, ইসরাইল ও ফিলিস্তিন উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক ও প্রতিবেশি রাষ্ট্রসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কতটুকু ভূমিকা রাখে তার উপর। জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা পাওয়া ফিলিস্তিনিদের জন্য বড় অর্জন হলেও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দেশটিতে এখনও রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বিভক্তি রয়ে গেছে। পশ্চিম তীর রয়েছে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ ফাতাহ এর নিয়ন্ত্রণে। অন্যদিকে গাজা উপত্যকার প্রায় ৪০ কিলোমিটার এলাকা শাসন করছে হামাস। নিজ স্থল ও আকাশ সীমার উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। গাজায় ইসরাইলি অবরোধ অব্যাহত রয়েছে। আরব বিশ্ব ফিলিস্তিনকে নিয়ে সমন্বিত কোন প্রয়াস আজ অবধি নিতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয় ইউনিয়ন তাদের নিজ স্বার্থেই মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য ধরে রাখতে এ অঞ্চলে এখনও শক্তিশালী ইসরাইলকেই তাদের ঘনিষ্ট মিত্র হিসেবে দেখতে চায়। আর জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেতে হলে যুক্তরাষ্ট্রসহ ভেটো ক্ষমতালাভকারী পাঁচটি রাষ্ট্রেরই সমর্থন প্রয়োজন, যা আদায় করা অনেক কঠিন বিষয়। জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থার সদস্য পথ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। কারণ, তাদের আইন অনুযায়ী জাতিসংঘের কোন সংস্থা ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিলে ওয়াশিংটন ঐ সংস্থাকে অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেবে। এমতাবস্থায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে হলে দেশটির দুই রাজনৈতিক দল হামাস ও ফাতাহকে পিএলও এর অধীনে একসাথে কাজ করা, তাদের নায্য ও যৌক্তিক দাবীকে বিশ্বায়িত করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকীকরণ এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয় ইউনিয়নের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে উঠতি বৈশ্বিক শক্তি চীন, ভারত ও অন্যান্য দেশের সাথে ঘনিষ্ট কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করার কোন বিকল্প নেই।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, জাতিসংঘ কর্তৃক ফিলিস্তিনকে 'পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের' মর্যাদা দান প্রকৃতার্থেই ফিলিস্তিনিদের জন্য স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্টার পথে বড় এক অগ্রগতি। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের বিরোধিতা সত্ত্বেও ফিলিস্তিনের এ বিজয় বৈশ্বিক পেক্ষাপটে দেশটির কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। তবে সাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের দু'টি চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এক. স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের দাবী তাদের মুসলিম জাতীয়তাবাদের জন্য নয়, বরং এজন্য যে, তারা আরব ফিলিস্তিনি। দুই. ইসরাইলকে প্রতিবেশি রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিয়ে তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহরাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। এছাড়া, স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইসরাইলের আধিপত্যবাদী আচরণ ও যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলী নীতিও ত্যাগ করতে হবে।

এসবকিছু সম্ভব একসূত্রে গাঁথা না হলে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্টার জন্য ফিলিস্তিনিদের হয়ত যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যহীন নতুন কোন বিশ্বব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ জাতিসংঘে তিন স্তর বিশিষ্ট সদস্য পদ রয়েছে ক. সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত সদস্য রাষ্ট্র, খ. সাধারণ পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত ভোটাধিকারবিহীন পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র, গ. পর্যবেক্ষক (ফিলিস্তিনের এ স্বীকৃতি 'গ' স্তর থেকে 'খ' স্তরে উন্নিত করেছে)।

২ Lenczowski, Georg, *The Middle East In World Affairs*, California, 1962, p. 70.

৩ ারমাজানী, ইয়াহ্ইয়া, *মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান* (মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক অনূদীত) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ৪৫৪।

৪ Lenczowski, Georg, p. 391.

৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৫।

৬ UNSCOP Report, 1947,en.wikipedia.org/wiki/UN_General_Assembly_Resolution_ 181 (Retrived on Dcemeber 16, 2012).

৭ UNSCOP Report, 1947,en.wikipedia.org/wiki/UN_General_Assembly_Resolution_ 181 (Retrived on Dcemeber 16, 2012).

৮ UNSCOP Report, 1947.

৯ UNSCOP Report, 1947.

১০ El-Eni, Roza, *Mandated Landscape: British Imperial Rule in Palestine*, 1929-1948, Routledge,2006, p. 367.

১১ http://www.reuters.com/article/2012/11/29/us-palestinians-statehood-qa-idUSBRE8AS1HB20121129 (Retrived on December 10, 2012).

১২ এ সংস্থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বছরে আট কোটি ডলার দিত। কিন্তু ফিলিস্তিনকে এর সদস্য পদ দেয়ায় দেশটি এ অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে।

১৩ *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ নভেম্বর ২০১২।

১৪ *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩০ নভেম্বর ২০১২।

১৫ http://www.reuters.com/article/2012/12/01/us-palestinians-statehood-idUSBRE8 AR0EG 20121201 (Retrived on Nov 30, 2012).

১৬ http://www.reuters.com/article/2012/11/29/us-palestinians-statehood idUSBRE8 AR0EG 20121129 (Retrived on December 10, 2012).

১৭ http://www.afp.com/en/node/737656 (Retrived on December 16, 2012).

১৮ http://www.afp.com (Retrived on December 2, 2012).

১৯ http://www.reuters.com/article/2012/12/01/us-palestinians-statehood-idUSBRE8 AR0EG 20121201 (Retrived on December 2, 2012).